রবীন্দ্রনাথের 'আপদ' গল্প : অধিকার বঞ্চিত নীলকান্তের জীবনবৃত্ত

সুব্রত রায়

সামাজিক জীব হিসেবে প্রতিটি মানুষেরই জন্মগত কিছু ন্যায্য অধিকার রয়েছে। মৌলিক চাহিদার মতোই খাদ্য বস্ত্র-বাসস্থান, খেলা-ধূলা ও শিক্ষাগত অধিকার একটি শিশুর মৌলিক অধিকারই বটে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা, ধনী-দরিদ্র অবস্থানগত ও শারীরিক-মানসিক বৈষম্য নিয়ে মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু জন্মানোর পর সমাজের মানুষের কাছ থেকে যে প্রাপ্তি ঘটা উচিত, যে সুযোগ সুবিধা, যে অধিকার বা যে সমবেদনা নবজাতক শিশুর প্রাপ্য তা গণতান্ত্রিক। একটি শিশুর ন্যূনতম বোধ ও উপলব্ধির জায়গা তৈরি হওয়া পর্যন্ত তাকে সেই ক্ষেত্র নির্মাণের সুযোগ দেওয়াটি মানুষের পরম কর্তব্য। যদি সে তা না পায় তবেই আমরা বলে থাকি তা অনৈতিক কিংবা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে। এই স্বাভাবিক বোধ বা চেতনা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। আবার একটি শিশুই হল মানব সম্পদের মূল আকর, ভবিষ্যতের সুনাগরিক এবং আশু দেশনায়ক কিংবা দেশের ধারক ও বাহক। অতএব মানব শিশু কিংবা বালক-বালিকারা যদি সমাজের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা না পায় কিংবা নিজের ন্যূনতম চাহিদাটুকু পূরণ করতে না পারে তবে কখনোই তারা ভবিষ্যতের যোগ্য উত্তরসূরী হতে পারে না। একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা একটি শিশু সমস্ত সুখ ভোগ করবে আর অপরজন তা থেকে বঞ্চিত হবে এটাই সমতাহীন গণতন্ত্র বিরোধী ব্যাপার। এমনটি হওয়ার অর্থই হল অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া—এই অসমদৃষ্টি, অসাম্য মনোভাব বা তাচ্ছিল্য ভরা ভাবনা শিশুর মনে বিরূপ মনোভাবের জন্ম দেয়। সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে সে প্রতিবাদে মুখর হয় ও দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়—কিন্তু একটি শিশুর প্রতিবাদের ভাষাই বা কতটা, অথচ তার মনে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার জন্ম নেয় এবং আত্মতুষ্টি বিধানের জন্য সে গোপনে অন্যায় ও অপরাধমূলক কার্য করে। একদিন সেই শিশুটি সমাজে কলঙ্কিত আখ্যা পায় ও খারাপ বলে প্রতিপন্ন করা হয় তাকে। কিন্তু এই খারাপ

হওয়ার মূল কারণটিকে সমাজ ক্ষতিয়ে দেখে না কোনোদিনই। অথচ একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বঞ্চনার শিকার যে শিশুটি সে যদি তার বেঁচে থাকার সামান্য রসদটুকু পেত তবে হয়তো অধিকার চেতনা কিংবা অপ্রাপ্তির বোধটি কোনোদিনই জন্মাত না, মনের মধ্যে দানা বাঁধার অবকাশই পেত না। আর দশ-পাঁচটি শিশু বালকের মতো সেও সমাজে বাঁচতে শিখত, সসম্মানে ও সমর্যাদা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াত—তার দ্বারা সমাজের ক্ষতি নয় বরং ভালোই হত, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বঞ্চিত অধিকার বোধের যন্ত্রণা মানুষকে অন্যায় ও পাপ পথে ঠেলে দেয়। এর থেকে বেরিয়ে আসার পথটিকে কিংবা প্রত্যাহ্বানকে রবীন্দ্রনাথ হয়তো দেখাতে চাননি কিন্তু অপ্রাপ্তি জনিত অধিকার বোধের ক্ষোভ যন্ত্রণা ও নিদারুণ মর্মজ্বালাটিকে রবীন্দ্রনাথ কাজে লাগিয়েছেন তাঁর 'আপদ' গল্পে। এই মূল্যবোধটিকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্প মধ্যে একটি অবহেলিত, অনাদরে ব.র্দ্ধিত শিশু-কিশোরের মানসিক পরিবর্তনের অপূর্ব বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। শিশুকাল থেকে মাতৃহীন, স্নেহাধিকার বঞ্চিত নীলকান্তের জীবন কিরণময়ী নাম্নী একজন সহানুভূতিশীল রমণীর অপরিসীম স্নেহের স্পর্শে কীভাবে পরিবর্তনমুখী হতে পারে; স্নেহের স্পর্শকাতর প্রেমপিপাসু ভালোবাসার বুভুক্ষু একটি কিশোরের জীবনে কীভাবে অধিকার চেতনা জাগ্রত হয় এবং কীভাবে অপ্রাপ্তিজনিত অধিকার বোধের যন্ত্রণা তাকে গুমরে-মুচরে, স্বভাব সিদ্ধ শিশুমনকে বিনষ্ট করে দেয় তারই অপূর্ব সুন্দর বর্ণনার আধারে 'আপদ' গল্পের অবতারণা।

গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে 'সাধনা' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩০১ বঙ্গাব্দে এবং 'গল্পগুচ্ছ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এটি স্থানপ্রাপ্ত হয়েছে। গল্পটি নিছকই একটি চরিত্রমুখ্য (Stories of character) গল্প। এর পাঠকালে আমরা যে শিশু-কিশোর চরিত্রটির সাক্ষাৎ পাই সে-ই নীলকান্ত। চন্দননগরের বাগানবাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই 'আপদ' গল্পের শুভারম্ভ। পত্নী কিরণময়ীর অসুস্থ শরীরকে ঠিক করার অভিপ্রায় নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমে হাওয়া বদলের জন্য শরৎবাবুদের চন্দননগরে আগমন ঘটে। নীলকান্তও একসঙ্গে দৈববশে জলমগ্ন হয়ে কিরণময়ীদের বাগান বাড়িতে এসে উপনীত হয়। সে ছিল পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ। তাই পেটের দায়ে শিশুকাল থেকেই যাত্রাদলে কাজ করতে হয়েছে তাকে। একবার সিংহবাবুদের বাড়িতে যাত্রাপালার জন্য তাদের দলকে ডাকা হয়েছিল। হঠাৎ পথমধ্যে নৌকা ডুবে যাওয়ায় নীলকান্ত দলছাড়া হয়ে গেল, কিন্তু সে ভালো সাঁতার জানত বলে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেল। এভাবে নীলকান্তের প্রথম সাক্ষাৎ হয়

কিরণময়ীর সঙ্গে। ঘটনাক্রমে নীলকান্ত কিরণময়ীদের বাগানবাড়িতেই থেকে গেল; তার বড়োই বিপদ এসেছিল, সে একটুর জন্য বেঁচে উঠেছে, হয়তো নদীতে পড়ে মারাই যেত। এই মনে করে তার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হল। সন্তানহীনা কিরণময়ী তাকে মাতৃস্নেহে ভালোবেসে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ আলনা থেকে শুকনো কাপড় বের করে দিলেন এবং একবাটি দুধ গরম করে তাকে খাওয়ালেন। নীলকান্তের কাছে বসে স্বহস্তে তাকে ভোজন করালেন। অবশেষে জানা গেল ছেলেটি ব্রাহ্মণের সন্তান এবং "ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই ... শুনিলেন সে যাত্রাদলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকান্ত। ... সে ভালো সাঁতার জানিত, কোনোমতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।" গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খণ্ড, (পৃ ২৩৩) এই প্রাথমিক পরিচয়ের অংশ থেকেই যে কয়েকটি সূত্রের সঙ্গে লেখক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সেগুলি হল—

১. গোঁফের রেখা এখনো ওঠেনি অর্থাৎ শৈশব থেকে কৈশোরে সন্ধিক্ষণে যাবার একটি চরিত্র নীলকান্ত অর্থাৎ সে বালক। অথচ আশ্চর্য যে বাল্যকালেই সে অনাথ, পিতৃমাতৃর স্নেহাধিকার বঞ্চিত একটি অভাগা শিশু।

২. যাত্রাদলের ছেলে অর্থাৎ শিশুকর্মী হিসেবে তার এই অংশগ্রহণ একজন অর্থহীন খাদ্যাধিকার বঞ্চিত বালকের প্রতিনিধি স্বরূপ সে। ক্ষুধানিবৃত্তির একমাত্র পথ হিসেবে যাত্রার অভিনয়টিকে নির্বাচন করতে সে বাধ্য। সে নিছক কর্মচারী, মালিক নয়, তাই যাত্রাদলে থেকেও অধিকারী মহাশয়কে তার মনে হয়েছে 'যমরাজে'র মতো। সাধারণত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেকেও যাত্রাদলে কাজ করতে দিতে নারাজ হয় অভিভাবকগণ কিন্তু ব্রাহ্মণ বালক হয়েও অভাবের তাড়নায় সে যাত্রাদলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। যেখানে মা-বাবা সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়—এটাই নিয়ম, সেখানে নীলকান্তের গোঁফের রেখা ওঠার আগেই নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হয়েছে।

৩. সে সাঁতার জানত। গ্রামের ছেলে হিসেবে কম বয়সে সাঁতার জানাটা অস্বাভাবিক কিছু নয় ঠিকই, কিন্তু এর অন্য একটি ব্যাখ্যাও দেওয়া চলে। তা হল, অতি অল্প বয়সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে সংগ্রামশীল জীবনে কী করে বাঁচতে হয়, সেই শিক্ষা আয়ত্ব করে নিয়েছে এই বালক নীলকান্ত। যা অপরাপর সব বালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৪. নীলকান্তকে তাচ্ছিল্য ভরে সম্বোধন করা হয়েছে "যাত্রাদলের ছোকরা" বলে। 'ছেলে' বললে যে সৌজন্যবোধ জন্মে, যে আদর ও মমতার স্পর্শ থাকে,

'ছোকরা' শব্দের প্রয়োগে কী তা সম্ভব? যে অবহেলা, অনাদর, উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের সুরে তাকে সম্বোধিত করা হল তা কি শুধুমাত্র যাত্রাদলের ছেলে বলে, না কি জলে ভেসে এসেছে বলে? কোনোটিতেই তো তার নিজের হাত ছিল না, স্বেচ্ছাকৃত নয়, অদৃষ্ট দোষের ভাগীদারি হওয়াটা তার অপরাধ হতে পারে না। বরং যে সমাজ তাকে সম্বোধন করল 'ছোকরা' বলে তাতে সমাজ বিচ্যুত অধিকার বঞ্চিত একটি বালকের চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক এই সামান্য সম্বোধনের মাধ্যমে। এটি দেখানো লেখকের অভিপ্রায় ছিল বলেই এই সম্বোধন।

কিরণময়ী মাতৃস্নেহে নীলকান্তকে খুবই আদর করতেন ও স্নেহ করতেন সন্দেহ নেই। শরৎবাবু ও তাঁর মাতার বাধা নিষেধকেও তিনি মানতেন না। শরতের পুরোনো জামা, জুতা মোজা, নতুন ধুতি-চাদর পরিয়ে তাকে বাবু সাজিয়ে তুলতেন। যদিও এতে নীলকান্তের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, "এই ধনী পরিবারের হাতে বদলি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল" (২৩৩ পৃ.)—এই আরামবোধের কারণই হল কোনোদিনই এজাতীয় সুখ ভোগ সে করেনি। এমনকি মানব শিশু হিসেবে সামান্য সুযোগ সুবিধাটুকু না পেয়ে পেটের দায়ে যাত্রাদলে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হয়েছে তাকে। অথচ একটি স্বাভাবিক মানব শিশুর বেড়ে ওঠার মতো জীবন তারও প্রাপ্য ছিল। তাই সামান্য এই সুযোগটুকু কিরণময়ীর কাছ থেকে পেয়ে সে ধন্য হল, আরামবোধ অনুভব করল। এই অনুভবটাই তো স্বাভাবিক। যদি আগে থেকেই সে এই সুযোগ পেয়ে আসতো তবে তার প্রতি এতো তীব্র লালসা জন্মাত না নীলকান্তের, একটি শিশুর স্বাভাবিক প্রাপ্তি হিসেবেই এই সুযোগ সুবিধাকে ধরে নিত সে। কিন্তু না পাওয়ার জন্যই হয়তো আজকের এই স্বাচ্ছন্দ্য আরামদায়ক মনে হয়েছে তার, এটি নিছক লালসা নয়—অপ্রাপ্তির বেদনাবোধজনিত অন্তঃকরণের সুতীব্র চাহিদা। আর সে তাই একে কোনোদিন হারাতে চায়নি। এই চাহিদা বা এই প্রাপ্তি একটি মানব শিশুর জীবন থেকে কখন হারিয়ে যায় না, যখন তা তার নিজের হয়, জন্মগত অধিকারের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু, যখন সে তা জন্মসূত্রে পায় না, নানান সামাজিক বাধা এসে দাঁড়ায় কিংবা কেউ দয়া করে সেটা দান করে তখন তা হারিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। যা চিরকালের জন্য নিজেরই হতে পারত যখন হঠাৎ কখনও বা পাওয়া যায়, তখন শিশুর মধ্যে যে কী জাতীয় অধিকারবোধ জন্মে এবং তাকে হারিয়ে ফেলার ভয়, বেদনা, ক্ষোভ ও অভিমান কীভাবে দানা বেঁধে ওঠে ও কার্যকরী হয় রবীন্দ্রনাথ গল্পের পরবর্তী পর্যায়ে সেটাই দেখাতে চেয়েছেন।

নীলকান্ত পিতৃ মাতৃহীন স্নেহকাতর ও ভালোবাসা লিপ্সু একটি বালক। এটি তার চরিত্রে শুধু সহজাত নয়, বরং অধিকার বঞ্চিত একটি বালকের অধিকার প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষাও বটে। কিরণময়ীর স্নেহস্পর্শ অনুভব করার আগে প্রকৃত ভালোবাসা বলে কোনোকিছু আছে বলে সে জানত না বা জানলেও তার আস্বাদ জীবনে সে কখনও পায়নি। কিরণময়ীর কাছ থেকে সে গভীর এক অপত্যস্নেহ ও সন্তান বাৎসল্যের স্পর্শ অনুভব করেছিল। যে ভালোবাসা ও মমতার সংস্পর্শ থেকে এতোকাল সে বঞ্চিত ছিল— আজ তার সুযোগ লাভ করে সে আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল। যদিও "শরতের কাছ হইতে কানমলা, চড়টা, চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসন প্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনাজনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীতে জল স্থল বিভাগের ন্যায় মানব জন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।" (২৩৪ পৃ.)—বাড়িতে পিতা বা পিতৃ স্থানীয় কেউ থাকলে তিনি তো সন্তানদের শাসন করেই থাকেন, তাতে সন্তানের ক্ষোভের কারণ দেখা যায় না। তাই বাল্য বয়স থেকে যে কঠোর অনুশাসনে যাত্রাদলের বিধি নিষেধ মেনে নীলকান্তকে অভ্যস্ত জীবন কাটাতে হয়েছে, সেই তুলনায় শরতের উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা অপমান তুচ্ছই মনে হয়েছে তার। বরং সেটিকেও তাঁর শাসন বলেই মেনে নিয়েছিল নীলকান্ত। কিন্তু পৃথিবীতে প্রহারের অংশই যে বেশি—এই মূল্যবোধ একটি শিশুমনে কখন দানা বাঁধে—যখন সে খেতে না পেয়ে পরে পরে মার খায় কিংবা তার জীবনটা দুঃখে, কষ্টে, যন্ত্রণায়, দুর্বিষহতায় কাটে। তাই এহেন চরিত্র সৃষ্টি যে রবীন্দ্রনাথের শিশু অধিকার চেতনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল ও নিদর্শন হবার যোগ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া, যে শরৎবাবু স্ত্রী কিরণময়ীকে ভালোবেসে, সামাজিক বাধা ও নিন্দাকে অগ্রাহ্য করে তাকে সুস্থ করার জন্য ডাক্তারী পরামর্শ ক্রমে হওয়া বদলের জন্য বাগান বাড়িতে নিয়ে এসেছেন, তিনিই কিন্তু কিরণময়ীর মনকে, তাঁর চাহিদাকে, মনোগত স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রাধান্য বা গুরুত্ব দেন নি, নীলকান্তের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানাননি। শরৎ বাবুও ইচ্ছা করলেই তাঁর পিতৃসত্তাকে জাগিয়ে তুলতে পারতেন কিন্তু তিনি তা না করে বরং বিপরীতমুখী কঠোর প্রতিক্রিয়া করেছেন এবং আচরণে তাঁর বিরাগভাজন মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তা হিসাবে শিশু অধিকার চেতনার দিকটি একবার ভেবেও দেখেননি। সর্বোপরি, বয়সের উল্লেখ প্রসঙ্গেও লেখক বলেছেন, "নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন।" (পৃ. ২৩৪) অর্থাৎ বাল্য

কৈশোরের মাঝামাঝি একটি সময়। অথচ এই বয়সে এসেই তার জগৎ-জীবন সম্পর্কে যে মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে ও তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে তার পশ্চাৎপটে রয়েছে আশৈশব অধিকার বঞ্চিত একটি মানব শিশুর নিদারুণ আর্তনাদ ও করুণ ক্রন্দন—যে বেদনাকে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র মাত্রাদান করে উপস্থাপন করলেন—বিশ্ব সাহিত্যে যার জুড়ি মেলা ভার।

নীলকান্তের মধ্যে জন্মগত একটি প্রতিভা ছিল তা হল তার অসামান্য অভিনয় কৌশল। তাইতো পেটের দায়ে হলেও "অতি অল্প বয়সেই যাত্রাদলে ঢুকিয়া, রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা ও বিদ্যার সখী সাজিত।" (পৃ. ২৩৪)। গোঁফ না ওঠার জন্য অবলীলায় মেয়ের অভিনয় করে যাওয়ার সুযোগটি ছিল। কিন্তু এই অভিনয় কৌশলের অসাধারণ দিকটিকেও সকলে অবজ্ঞার চোখেই দেখেছেন, "বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারো কাছে পাইত না।" (পৃ. ২৩৪) অযাচিত, আশ্রিত বলে শরৎবাবু তার অভিনয়কে অবহেলার চোখেই দেখতেন। তাই নীলকান্তের এই সৎ গুণটিকে প্রোৎসাহিত করার পরিবর্তে তাকে অনুৎসাহের গহ্বরে অনায়াসেই ফেলে দিতে কুণ্ঠিত ও দ্বিধাবোধ করেননি শরৎবাবু। তাই যদিও কিরণময়ী অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে দ্বিপ্রাহরিক অবসর বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে নীলকান্তের অভিনয় দেখতেন, কিন্তু শরৎবাবুকে তাঁর অংশীদার করতে গেলে তিনি "অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইত না" (পৃ. ২৩৩) বরং চাপা পড়ে যেত। একটি সাধারণ পরিবারের সন্তানের মধ্যে থাকা যাবতীয় গুণগুলিকে উৎসাহের মাধ্যমে উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। অথচ নীলকান্তের মধ্যে থাকা গুণটিকে অবহেলা করার জন্য তা বিকশিত হবার পথই পেল না, এটা কি বঞ্চনা নয়? অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আর কী প্রমাণ দেবেন রবীন্দ্রনাথ।

নীলকান্ত হতে পারে স্বভাব চঞ্চল, দুরন্ত বালক এবং লেখা পড়ায় অমনোযোগী। কিন্তু তাই বলে কি তার মধ্যে নিহিত থাকা সদ্‌গুণগুলির কোনো মূল্য নেই? এমন অনেক শিশুই তো পৃথিবীতে রয়েছে যারা লেখাপড়া নয়, অন্য পথ ধরে বড় হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বলে কি তারা শিশুর যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, না কি তারা অবহেলার অমানিশায় তলিয়ে গেছে? তবে নীলকান্তের জীবনে কেন এতো অপ্রাপ্তি? আসলে নীলকান্ত কোনো একক চরিত্র নয়, সে অধিকার বঞ্চিত শিশুদের প্রতিনিধি যাদের কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা হয় শুধু 'আপদ' বলেই। কিন্তু কেন তারা আপদ হয়ে উঠল—তা তলিয়ে দেখে বিচার করে না কেউ, তাইতো রবীন্দ্রনাথ 'আপদ' কথাটিকে ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করলেন। অথচ নীলকান্ত সম্পর্কে

আমাদের জানালেন—"তাহার বৃহৎ তারা বিশিষ্ট দুইটি চক্ষুর মধ্যে একটা সারল্য ও তারুণ্য ছিল।" (২৩৪ পৃষ্ঠা) এই স্বভাব কোমল বালকটি কখন যে ক্রূঢ় ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে—অধিকার না পাওয়ার বঞ্চনা তাকে ডুকরে খেয়েছে, কখন যে তাকে প্রচণ্ড অভিমানী, হিংসুক ও খল চরিত্র করে দিয়েছে, সমাজ মানুষের সহানুভূতি ও ভালোবাসার অভাব যে মানুষকে কতটা ক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে কিংবা বিপথে পরিচালিত করে অন্যায় কার্যে লিপ্ত করতে পারে তারই অসামান্য ইঙ্গিত দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী পর্যায়ে।

রবীন্দ্রনাথ একটি গানের উল্লেখ প্রসঙ্গে আমাদের জানান যে, নীলকান্তের জীবনটি 'তুচ্ছ'—কেন একটি শিশুর জীবন তুচ্ছ হতে যাবে? নিশ্চয়ই সে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত, প্রাপ্য অধিকার বিহীন বলেই সে নগণ্য। নতুবা মানুষ কখনওই 'তুচ্ছ' হয়ে জন্মায় না, সমাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতিই তাকে তুচ্ছ করে দেয়—যেমন দিয়েছে নীলকান্তকে।

ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ শরৎবাবুর ভাই সতীশ কলেজের বন্ধে বাগান বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। সতীশ কিরণময়ীর সমবয়সী ছিল এবং তাদের সম্পর্কটিও ছিল বন্ধু স্থানীয়। তাই সতীশ আসাতে কিরণময়ীর সমস্ত দিন আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হত এবং তাকে নিয়েই কিরণময়ী ব্যস্ত থাকতেন বেশিক্ষণ। ইতিপূর্বে অর্থাৎ সতীশের আগমনের পূর্বে নীলকান্তই ছিল কিরণময়ীর স্নেহ-ভালোবাসার একমাত্র অংশীদার। সতীশের আবির্ভাবে সেই অংশের ভাগিদার চলে এল এবং অংশীদারের মূল্য যেন কিছুটা কমে এল ও স্তিমিত হতে থাকল। ফলে পূর্বের সমস্ত নিয়মের পরিবর্তন ঘটে গেল—যা নীলকান্তকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। কিরণময়ীর এই মানসিক পরিবর্তন নীলকান্তকে ভীষণভাবে আঘাত হানল ও ব্যথিত করে তুলল। কিরণময়ী ডেকে না খাওয়ালে তার অন্তর ভারাক্রান্ত ও বিষাদময় হয়ে উঠত, মুখ বিস্বাদ হত, সে না খেয়ে উঠে পড়ত এবং বক্ষ বেদনায় ভরে উঠত। ফলে কিরণময়ীর স্নেহ থেকে ক্রমান্বয়ে বঞ্চিত হতে হতে মানসিক বিকার-গ্রস্ত হয়ে পড়ল সে। সে "কী উপলক্ষ্য করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পাইত না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্ত রসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।" (পৃ. ২৩৫) অপ্রাপ্তি জনিত কারণেই যে শিশুমন আক্রোশে পূর্ণ হয়ে ওঠে আর তার মধ্যে ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়—তারই ইঙ্গিত বহন করে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি। সে কিরণময়ীর স্নেহাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য কখনও তাঁকে দোষী ভাবেনি, সে বিবেচনা করত সব কিছুর মূলে রয়েছে কুমন্ত্রণা দাতা সতীশ। সে সতীশকে পরম শত্রু বলে জ্ঞান করত।

আবার সে স্পষ্টভাবে তার বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ নিয়ে শত্রুতা করার সাহসও পেত না। তবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। আর সুযোগ মতো তার ছোটখাটো অসুবিধা ঘটিয়ে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করত ও গভীর আত্মতৃপ্তি অনুভব করত। আসল কথা হল, সে কখনও কিরণময়ীর স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত থাকতে চায় নি। কেননা তিনি ব্যতীত এই জগৎ সংসারে তাকে ভালোবাসা দেওয়ার মতো অন্য কেউই ছিল না, তাছাড়া কিরণময়ীও তাকে সন্তানের মতোই স্নেহদান করেছিলেন। কিন্তু সতীশ আসাতে সেই ভালোবাসা দানের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটল ও তার পরিমাণও হ্রাস পেতে থাকল।

একমাত্র কিরণময়ীর স্নেহের অংশেও যখন ভাগ বসানোর জন্য শরতের ভাই সতীশের কোলকাতা কলেজের ছুটিতে বাগান বাড়িতে আগমন ঘটে তখন সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। সতীশের আগমনে কিরণ খুবই খুশি হন—"উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাস পাশ বিস্তার" করতে থাকেন। (পৃ. ২৩৫)—এই রূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে উভয়েই সমস্ত দিন তর্জন ধাবন হাস্য এমনকি মাঝে মাঝে কলহ ক্রন্দন সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তি স্থাপন চলতে থাকে। এজাতীয় মাখামাখি প্রত্যক্ষ করেই নীলকান্তের মন তীব্র তিক্ত রসে ভরে উঠেছিল। কিন্তু সরাসরি কিছু করতে না পারায় সে অহেতুক তার পোষা কুকুরটাকে লাথি মারত। শিশুমনের ক্ষোভের প্রকাশ ঘটলেও এতোসত্ত্বেও সে শান্তি পেত না। মর্মজ্বালা তাকে তাড়িয়ে বেড়াতো।

যারা ভালো খেতে পারে তাদের পাশে বসিয়ে খাওয়াতে কিরণময়ী অত্যন্ত ভালবাসেন। এই ক্ষমতা নীলকান্তের ছিল। তাই নীলকান্তকে তিনি সুখাদ্য দ্রব্য খাওয়ানোর জন্য পুনঃপুনঃ ডাকতেন এবং নীলকান্তও তা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করত। কিন্তু সতীশের আগমনে অবসর না পাওয়ায় নীলকান্তের আহার স্থলে কিরণকে অনুপস্থিত থাকতে হত। ইতিপূর্বে তার ভোজনের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটত না। কিন্তু সতীশের আগমনে তাতে ব্যাঘাত জন্মালো। তাই আজকাল কিরণ নিজে গিয়ে না খাওয়ালে তার বক্ষ ব্যথিত হত, মুখ বিস্বাদ হয়ে উঠত, সে না খেয়ে উঠে পড়ত "বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত 'আমার ক্ষুধা নাই'। (পৃ. ২৩৬) যে নীলকান্ত খাদ্য রসিক ও ভোজন প্রিয় ছিল—সুখাদ্য দ্রব্য বারবার খাওয়ার অনুরোধকে অস্বীকার করত না, সে কি না আজ নির্দ্বিধায় বলতে পারে তার খিদে নেই। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তার পেটের জ্বালা নয়, তার লোভ-লালসা নিহিত ছিল চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রেম ভালোবাসার প্রতি। এটা পেয়েই সে খুশি ও তৃপ্ত ছিল, আজ

থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় এমন একটি আশা রাখতেন তিনি। তিনি ধনী সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান হওয়ার দরুন বহু ভৃত্য পরিবৃত মহলে বেড়ে ওঠার জন্য প্রাচুর্যের প্রতুলতা থাকার জন্য তিনি ভাবতেই পারতেন না যে একটি শিশু তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কীভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে? শিশুর মনে প্রত্যাহ্বানের সুরটি অনুরণিত হওয়ার পূর্বেই ক্ষুণ্ণিবৃত্তি তাকে অপরাধ প্রবণতার দিকে টেনে নিয়ে যায়, এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ধারণা। তাই সার্থক অভিনেতা হওয়ার অপরিসীম গুণ নীলকান্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও বঞ্চিত অধিকার তাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অন্তরায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। সবাই তো সমান হয় না, সকলের মনোবলও এক নয়, তাই উনিশ শতকের নীলকান্ত অধিকার বঞ্চিত হয়েও মাথা তুলে দাঁড়ানোর কথা ভাবতেও পারেনি। অথচ পরবর্তী কালে বিশ শতকের কল্লোলের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সারেঙ' গল্পটিতে পাই নাসিমের সুযোগ্য প্রত্যাহ্বানের একটি ইঙ্গিত। সেখানে মা থেকেও নাসিম মাতৃস্নেহ বঞ্চিত। তাই অধিকার সে কেড়ে নিতে প্রস্তুত হয়েছে, নিজের বড়ো হওয়ার পথ সে বেছে নিয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের নীলকান্ত, রবীন্দ্রনাথের হাতের নীলকান্তের সর্বক্ষণই মনে হয়েছে তার মা থাকলে হয়তো এই দুরবস্থা হত না। তাইতো ক্ষোভে দুঃখে, মর্ম জ্বালায় বুক ভরা অভিমান নিয়ে সতীশকে সর্বদা ঘৃণার চোখে দেখত নীলকান্ত ও হিংসা করত কিন্তু স্পষ্টত সতীশের কোনোরূপ শত্রুতা করতে সাহস পেত না। কিন্তু সুযোগ ও সময় সাপেক্ষে তার ছোটখাটো অসুবিধা ঘটিয়ে প্রীতিলাভ করত। গল্পমধ্যে এর প্রমাণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই প্রতিবাদ কী যথাযোগ্য, তা বঞ্চনার সমধর্মী কি?

অবশেষে, কিরণের দেশে ফেরার সময় হল, সকলেই প্রস্তুত হতে লাগল। সতীশও সঙ্গে যাবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেউ সঙ্গে নেবে না। কিরণময়ী নীলকান্তকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব করলে তাতে শাশুড়ী, স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি জানালেন, ফলে "কিরণ তাহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন।" (পৃ. ২৩৬) তারা সকলেই জানতেন যে নীলকান্তের কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। তবু এই বিশ্ব সংসারে তাকে একা ছেড়ে দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর কাজ করতে একবারও তাদের বিবেকে বাঁধল না। কিরণময়ীর হয়তো ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাও টিকিয়ে রাখতে পারলেন না। হয়তো বাধ্য হয়ে কিংবা পরিবারের চাপে পড়ে—তবু তো তিনিও মাতৃতুল্য হয়েও একাকী ছেড়ে দিতে চাইলেন নীলকান্তকে। মাতৃ স্নেহে অপর একটি পুত্রকে ভালবাসা আর মায়ের ভালোবাসা যে এক নয় রবীন্দ্রনাথ কিরণের এই সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। তাই যে নীলকান্ত জন্মাবধি

মাতৃস্নেহে বঞ্চিত তাকে সন্তানহীনা সমৃদ্ধশালী কিরণময়ী মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথা ভাবলেন কী করে। তাইতো এত বড়ো বিশ্বের দরবারে তাকে একা ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করলেন। যদিও দেশে ফেরার আগে নীলকান্তকে ডেকে কিরণময়ী স্নেহ বাক্যে তাকে স্বদেশে যেতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু অবহেলার পর মিষ্টি বাক্য ও সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে নীলকান্ত বুকভরা অভিমানে আর থাকতে পারে না, "একেবারে কাঁদিয়া উঠিল।" (পৃ. ২৩৭)। কিরণময়ীর চোখ ছলছল করে উঠল কিন্তু বৃহত্তর পদক্ষেপ গ্রহণে অসমর্থ হলেন এবং তিনি মনে করেন ক্ষণিকের ভালোবাসা দেওয়াটাও তার উচিত হয়নি, এতে বরং অনুতপ্তই হলেন। এটা মনে হল না তাঁর যে, কিছু দিন হলেও তো তবু তিনি নীলকান্তকে ভালবাসতে পেরেছেন—এ ও কম কী? কিন্তু 'অনুতপ্ত' হওয়ার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অধিকার বিহীন ভালোবাসার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। এর মর্ম শুধুমাত্র বঞ্চিতজনই অনুধাবন করতে পারবে। অন্যদের তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। তাই সতীশ কাছে দাঁড়িয়ে থেকে এতো বড়ো ছেলের কান্না দেখে ভারি বিরক্ত হল। "আরে মলো। কথা নাই বার্তা নাই একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির।" (পৃ. ২৩৭) সতীশের এই টিপ্পনি সূচক উক্তির জন্য কিরণময়ী অবশ্য তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তাঁর মাতৃসত্তা তখনও কিছুটা হলেও জাগ্রত ছিল। কিন্তু সতীশ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল, "তুমি বোঝ না বউ দিদি, তুমি সকলকেই বড় বেশি বিশ্বাস কর, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মুষিক হওয়ার আশঙ্কায় আজ মায়া কান্না জুড়িয়াছে, ও বেশ জানে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।" (পৃ. ২৩৭) একথা শুনে নীলকান্ত দ্রুত সেই স্থান পরিত্যাগ করল। এই অবহেলা ভরা মনোভাব কোলকাতা কলেজে পড়ুয়া সতীশের মুখে বেমানান। বরং নীলকান্তের মতো একটি অনাথ বালককে তার ন্যায্য ও প্রাপ্ত অধিকার দানের প্রচেষ্টা ও সেই অভিমুখে কাজ করার তৎপরতা ও প্রবণতা সতীশের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। সে অনায়াসেই বউদি কিরণময়ীকে বলতে পারত নীলকান্তকে দত্তক নেওয়ার কথা এবং সমর্থনে যুক্তি সাজিয়ে দাদা শরৎবাবুকে বোঝানোর এবং রাজি করানোর দায়িত্বটিও সতীশের ছিল। কিন্তু তা না করে সে নীলকান্তকে বিদ্রূপ করল, ব্যঙ্গের কষাঘাত হেনে কথার জালে কিরণের সকাশে নীলকান্তের চরিত্রদোষ ধরিয়ে দিল। কারণ, শিক্ষিত সতীশ খুব ভালভাবেই জানে যে, এই অধিকার (পুত্রাধিকার) যদি নীলকান্ত পায়, তবে সন্তানহীন দাদা-বৌদির একক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে সে তা পাবে না বা ভোগ করতে পারবে না। তাই সে এক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার দান তো

দূরে থাক বরং আপন হীনস্বার্থসিদ্ধির জন্য কূট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করল—যাতে কোনোক্রমেই নীলকান্তকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া না হয়।

এদিকে বালক নীলকান্ত সতীশের ধাঁরালো মন্তব্যে বিষণ্ণ ও অবষাদগ্রস্ত হয়ে অদূরে প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলতে থাকে। তার মন সতীশের কাল্পনিক মূর্তিতে "ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, সূচ হইয়া বিধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র লাগিল না।" নীলকান্তের মর্মস্থলই বরং এতে বিদ্ধ হতে লাগল।

উল্লেখ্য যে, সতীশ কোলকাতা থেকে ফেরার সময় একটি শৌখিন দোয়াতদান কিনে এনেছিল, "তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার ওপর দোয়াত বসানো এবং মাঝে একটা জর্মন রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চু পুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে।" (পৃ. ২৩৭) এই দোয়াতদানটি সতীশের খুব বেশি প্রিয় এবং অত্যন্ত পছন্দের ছিল, সেটির খুব যত্ন ছিল তার। সে প্রায়ই সেটিকে সিল্কের রুমাল দিয়ে সযত্নে পরিষ্কার করে রাখত। সেই দোয়াত দানটির ওপর নীলকান্তের আক্রোশ জন্মালো। এই দোয়াতদানটির মতো কিরণময়ীও নীলকান্তের অতি প্রিয় ছিল, কিন্তু সতীশ আসাতেই সে তাঁর মাতৃসম ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমন একটি মনোভাব, ক্ষোভ ও ক্রোধভরা বেদনা তার মনে ক্রিয়া করছিল। তাই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নীলকান্ত সতীশের দোয়াতদানটি চুরি করে বসল যাতে সতীশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পারে, কোনো প্রিয় বস্তু হারানোর মানসিক যন্ত্রণাটা কতখানি কষ্টকর ও বেদনাদায়ক। যেভাবে নীলকান্ত কিরণময়ীর ভালোবাসার কোমল স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে কিরণময়ীকে নিজের কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে মানসিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, ও বিকার গ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তেমনই সতীশ যেন তার প্রিয় দোয়াতদানটি হারিয়ে যাবার পর অনুরূপভাবে মর্মাহত হয়। শখের এই দোয়াতদানটি চুরি করার মূল কারণই ছিল সতীশের প্রতি হিংসা, ঈর্ষা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব। একটি শিশু তার ন্যায্য অধিকার না পেলে সে যে জ্বালাময় হয়ে উঠতে পারে, কুপথে পরিচালিত হতে পারে, তার দ্বারা যে সমাজের কিংবা দেশের ভবিষ্যতে কোনো বৃহত্তর ক্ষতি হতে পারে রবীন্দ্রনাথ সামান্য দোয়াতদান চুরির ঘটনাকে আশ্রয় করে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। সতীশ তার স্নেহের অংশে ভাগ বসানোতে কোনো কথা থাকতে পারে না যদি কিরণময়ী সতীশের আগমনে নীলকান্তকে পূর্বের ন্যায়ই স্নেহাদর করতেন, তার খাদ্য গ্রহণের সময় তার পাশে থাকতেন, তার দেখাশোনাটা ঠিকঠাকভাবে

বিশ্বাসকে নাকচ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং নীলকান্তের বাক্স খুঁজে দেখার ক্ষেত্রে প্রবল আপত্তি তুলে বাধা দান করেছেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এই নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি" কিরণের মনে দয়ার উদ্রেক হওয়ায় গ্রামত্যাগ করার পূর্বে কিরণ স্নেহবশত তাকে কিছু জামা জুতা উপহার দিতে যাওয়াতে হঠাৎ তিনি তার বাক্সে লাটাই কঞ্চি, কাঁচা আম কাটার জন্য ঘসা ঝিনুক ইত্যাদি নানা জাতীয় পদার্থের সঙ্গে চুরি যাওয়া দোয়াত দানটিও দেখতে পেলেন। কিন্তু কিরণময়ী কোনোরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করে বস্তুটি যথাস্থানে রেখে উপহার ও একটি দশ টাকার নোট বাক্সে ভরে রেখে সরে এলেন। এই সমস্ত ঘটনাই নীলকান্ত অগোচরে থেকে প্রত্যক্ষ করল এবং মনে করল, "কিরণ স্বয়ং চোরের মতো তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে কেবল সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসা সাধনের জন্য একাজ করিয়াছে, সে যে ওই জিনিসটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্তের দুর্বলতা বশত ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সের মধ্যে জুড়িয়াছে, এ সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। সে চোর নয়, সে চোর নয়। তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী।" (পৃ. ২৩৮) রবীন্দ্রনাথের এহেন বক্তব্য থেকেই বোঝা গেল, সে আভিধানিক অর্থে চোর নয়, পরিস্থিতির চাপে ও অধিকার বঞ্চনার দাবিতে চৌর্য বৃত্তিকে সাময়িকভাবে হাতিয়ার করে নিয়েছিল মাত্র। এটি তার প্রবৃত্তি নয়, কষ্ট করে খেটে খাওয়াই তার জীবনের স্বধর্ম। যাত্রাদলে যোগদান সেই পরিচয়কেই বহন করে চলে। অবশেষে, নীলকান্ত মনের দুঃখে চোরের অপবাদ সহ্য করতে না পেরে কাউকে কিছু না জানিয়ে বাক্সটিকে রেখে এক অন্ধ আবেগে, অভিমান ক্ষুব্ধ চিত্তে ও মর্ম জ্বালায় আরক্ত হয়ে শরৎ ও কিরণময়ীদের বাগানবাড়ি পরিত্যাগ করে এক অজানা অনির্দেশের অভিযানে যাত্রা করল।

আলোচ্য গল্পে সামান্য একটি ঘটনার আধারে লেখক মানব জীবনের এক গভীর মর্মসত্যকে আলোকিত ও উদ্ঘাটিত করেছেন। সাধারণের দৃষ্টিতে বিচার করলে 'আপদ' গল্পের শিশু নায়ক নীলকান্ত হয়তো অপরাধী, কিন্তু লেখকের দরদী ও সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পাঠক সমাজ ভিন্নমুখী নীলকান্তের পরিচয় লাভ করে—যার জন্য সে আপদ হয়েই থাকে না, হয়ে ওঠে অভাগা নীলকান্ত। শিশু অধিকার চেতনার বিচারে নীলকান্তকে আপদ আখ্যা না দিয়ে দুর্ভাগা বলার অবকাশ এসেছে আজ। লেখক সমগ্র গল্পটিতে এক বিশিষ্ট সহানুভূতি যুক্ত করেছেন

ঠিকই, তবু তাকে আপদ বলেই আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, বিধিবদ্ধভাবে যে আইন বা অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয় বা অতি সহজেই বলা হয়ে থাকে, একটি শিশুর অন্তকরণের খোঁজ না নিয়ে তার ওপর সেই দাবি খাঁটে না বলেই সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে নীলকান্তের মতো বালক 'আপদ' পদবাচ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন যে স্নেহের দাবির কাছে আত্মীয়, পর, ধনী দরিদ্র, রক্তের সম্পর্ক ও সম্ভব-অসম্ভবের বিচার লোপ পায়, তার বেশি কিছু না দেখিয়েই পাঠকের বিচারের মাপকাঠিতে ছেড়ে দিয়েছেন চরিত্রটিকে এবং গল্পের যবনিকা টেনে ছোটগল্পের স্বধর্ম রক্ষা করেছেন।

অতএব, দেখা গেল, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে একটি শিশু কীভাবে সমাজের চোখে আপদ হয়ে উঠল তারই সুচিত্র পরিবেশিত হয়েছে গল্পটিতে। কিরণময়ীর মতো একজন স্নেহপরায়ণা রমণী যদিওবা খানিকটা উপলব্ধি করেছিলেন নীলকান্তের অধিকার বিহীনতার বেদনাকে, কিন্তু তাঁর পক্ষেও সমাজ ও পরিবারের ঊর্ধ্বে ওঠার সক্ষমতা ছিল না। এই তো সমাজ? এহেন যাতাকলের মুখে দাঁড়িয়ে একটি হতভাগা শিশুর প্রতিবাদের ভাষা থাকে না, তার ক্ষমতাই বা কতটুকু আর প্রতিবাদ করার শক্তি ও সামর্থ্য তো ক্ষমতাশালীদের দ্বারা রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তাই প্রতিবাদ করলে শুনবেই বা কে, শুনেছে কি কেউ? নানাভাবে নীলকান্ত তো সেই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভাগ্যাহত হয়ে সকলের কাছে অপরাধী হয়েছে সে, অপবাদ ও বদনাম মাথায় নিয়ে নীরবে সব সহ্য করে পালাতে বাধ্য হয়েছে সে—পায়নি তার প্রাপ্য অধিকারটুকু। অভিমান ক্ষুব্ধ শিশুমনের ক্ষীণ প্রতিবাদের কোনো মূল্য কি সমাজ-মানুষ তাকে দিয়েছে? এই শিশুটি যখন বঞ্চিত হতে হতে মাথা তুলে দাঁড়াবার সক্ষমতা পায়, প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়, কার্যকলাপে তার পরিচয় ধরা পড়ে—ততোদিনে সে যেমন আর শিশুটি হয়ে থাকে না, তেমনই ইতিমধ্যে সমাজে সে আপদ রূপে পরিচিত হয়েই যায়—আর অবকাশ থাকে না, তাকে সুযোগ করে দেওয়া হয় না, অবসর পায় না সে সংশোধনের—তার দুরন্তপনা, চাঞ্চল্য ও শিশুমনের অন্যায় প্রবণতাগুলি তাকে আপদ করেই তোলে। কিন্তু উদার দৃষ্টিকোণ থেকে, অনুভূতিশীল মনের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাই হল দুরন্তপনা। বড় বড় বিজ্ঞানী, মনীষী, সাধক প্রমুখ অনেকেই বাল্যকালে দুরন্তপনার জন্য যেমন বিখ্যাত হয়ে আছেন তেমনই পরবর্তীকালে এঁরাই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নানা দিকে—তাঁদের ভিন্নমুখী প্রতিভায়

আলোকিত করেছেন জগতকে। যেমন—কৃষ্ণ, চৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ এঁদের মধ্যে অন্যতম। অথচ সুযোগ না পাওয়ার জন্য এবং অধিকার দিতে না চাওয়ায় এই দৌরাত্মই নীলকান্তের ললাটে বিজয় তিলক না পড়িয়ে আপদের কলঙ্ক লেপন করে দিয়েছে।

এভাবেই শিশু অধিকার চেতনার ভিত্তিতে নীলকান্ত চরিত্রের ক্রমপরিণতিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 'আপদ' গল্পটিতে তুলে ধরেছেন।

তা না পাওয়ার বেদনায় মন বিষাদময় ও ভারাক্রান্ত। বারবার অনুরোধ করেও তাকে খাওয়ানো যেত না। স্নেহ বুভুক্ষু মনের কষ্ট যে কতটা তীব্র হতে পারে রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, "... সে আপন শয়ন গৃহের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার ওপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া মুখের ওপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে, কিন্তু কী তাহার নালিশ, কাহার ওপরে তাহার দাবি, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে। যখন কেহই আসে না, তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমল স্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।" (পৃ. ২৩৬)—স্নেহ বঞ্চিত, অধিকার বঞ্চিত, মাতৃহীন বালকের অধিকার হীনতার এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে। আজ তো তবুও কিরণময়ীর খানিক স্নেহস্পর্শ তার অদৃষ্টে জুটেছে—যা না পাওয়ার দরুণ সাময়িকভাবে হলেও অভিমান হওয়ারই কথা। মাতৃহীনতার মর্ম যন্ত্রণা, অবজ্ঞা, অনাদর, অবহেলা বক্ষে ধারণ করে ক্ষুধার্ত নীলকান্ত আশৈশব কত যে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে তার খবর কে রাখে? হয়তো সেই জন্যই তার মধ্যে ক্রিয়া করে নানা সন্দেহ মূলক ভাবনা, দানা বাঁধে বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়া। ফলে নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হয়, সতীশই বুঝি কিরণের কাছে তার নামে সর্বদাই অভিযোগ ও নালিশ করে। যেদিন কিরণ কোনো কারণে গম্ভীর হয়ে থাকে সেদিন নীলকান্ত মনে করে সতীশের চক্রান্তে কিরণ বোধহয় তারই ওপর রাগ করে আছেন। একটি অপাপবিদ্ধা, সর্ব কলুষ মুক্ত শিশু যখন ভূপৃষ্ঠে জন্ম গ্রহণ করে তখন তার স্বভাব কোমল চেহারাটি আমাদের আকৃষ্ট করে। অথচ পরিস্থিতির চাপে পড়ে অবহেলায় ও অনাদরে ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত হয়েই সে একদিন নিষ্ঠুর ও অপরাধী হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। তাইতো নীলকান্ত গোপনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়, "আর জন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।" (পৃ. ২৩৬)—একজন ব্রাহ্মণের অভিশাপ কখনও নিষ্ফল হয় না জেনেই নীলকান্ত মনে মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। এথেকে শুধুমাত্র সতীশের প্রতি থাকা তার আক্রোশ নয়, বরং ব্রহ্মশাপ যদি ফলেও যায় তবুও তো সে পরজন্মে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না—এরূপ একটি আশার ইঙ্গিত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যেহেতু জন্মসূত্রে ঈশ্বর এবং পরবর্তী সময় সমাজ ও মানুষ নীলকান্তকে কোনো ন্যায্য অধিকার দেয়নি তাই ব্রহ্মতেজের বশবর্তী হয়েও পরজন্মে যদি তার সমস্ত সুখ ভোগ প্রাপ্তি ঘটে তবুও তার শান্তি, সে কথা ভেবেই সে শান্তি পায়। এই শান্তি শুধু মাত্র নীলকান্তের নয়, রবীন্দ্রনাথেরও বটে। কারণ, তিনি আশাবাদী তাই আগামীতে শিশুর ন্যায্য অধিকার

মাতৃস্নেহে বঞ্চিত তাকে সন্তানহীনা সমৃদ্ধশালী কিরণময়ী মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথা ভাবলেন কী করে। তাইতো এত বড়ো বিশ্বের দরবারে তাকে একা ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করলেন। যদিও দেশে ফেরার আগে নীলকান্তকে ডেকে কিরণময়ী স্নেহ বাক্যে তাকে স্বদেশে যেতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু অবহেলার পর মিষ্টি বাক্য ও সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে নীলকান্ত বুকভরা অভিমানে আর থাকতে পারে না, "একেবারে কাঁদিয়া উঠিল।" (পৃ. ২৩৭)। কিরণময়ীর চোখ ছলছল করে উঠল কিন্তু বৃহত্তর পদক্ষেপ গ্রহণে অসমর্থ হলেন এবং তিনি মনে করেন ক্ষণিকের ভালোবাসা দেওয়াটাও তার উচিত হয়নি, এতে বরং অনুতপ্তই হলেন। এটা মনে হল না তাঁর যে, কিছু দিন হলেও তো তবু তিনি নীলকান্তকে ভালবাসতে পেরেছেন—এ ও কম কী? কিন্তু 'অনুতপ্ত' হওয়ার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অধিকার বিহীন ভালোবাসার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। এর মর্ম শুধুমাত্র বঞ্চিতজনই অনুধাবন করতে পারবে। অন্যদের তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। তাই সতীশ কাছে দাঁড়িয়ে থেকে এতো বড়ো ছেলের কান্না দেখে ভারি বিরক্ত হল। "আরে মলো। কথা নাই বার্তা নাই একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির।" (পৃ. ২৩৭) সতীশের এই টিপ্পনি সূচক উক্তির জন্য কিরণময়ী অবশ্য তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তাঁর মাতৃসত্তা তখনও কিছুটা হলেও জাগ্রত ছিল। কিন্তু সতীশ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল, "তুমি বোঝ না বউ দিদি, তুমি সকলকেই বড় বেশি বিশ্বাস কর, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মুষিক হওয়ার আশঙ্কায় আজ মায়া কান্না জুড়িয়াছে, ও বেশ জানে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।" (পৃ. ২৩৭) একথা শুনে নীলকান্ত দ্রুত সেই স্থান পরিত্যাগ করল। এই অবহেলা ভরা মনোভাব কোলকাতা কলেজে পড়ুয়া সতীশের মুখে বেমানান। বরং নীলকান্তের মতো একটি অনাথ বালককে তার ন্যায্য ও প্রাপ্ত অধিকার দানের প্রচেষ্টা ও সেই অভিমুখে কাজ করার তৎপরতা ও প্রবণতা সতীশের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। সে অনায়াসেই বউদি কিরণময়ীকে বলতে পারত নীলকান্তকে দত্তক নেওয়ার কথা এবং সমর্থনে যুক্তি সাজিয়ে দাদা শরৎবাবুকে বোঝানোর এবং রাজি করানোর দায়িত্বটিও সতীশের ছিল। কিন্তু তা না করে সে নীলকান্তকে বিদ্রূপ করল, ব্যঙ্গের কষাঘাত হেনে কথার জালে কিরণের সকাশে নীলকান্তের চরিত্রদোষ ধরিয়ে দিল। কারণ, শিক্ষিত সতীশ খুব ভালভাবেই জানে যে, এই অধিকার (পুত্রাধিকার) যদি নীলকান্ত পায়, তবে সন্তানহীন দাদা-বৌদির একক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে সে তা পাবে না বা ভোগ করতে পারবে না। তাই সে এক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার দান তো

করতেন, তবে সম্ভবত বালক নীলকান্তের মনে এই ক্ষোভ জন্মাতো না। কিন্তু নীলকান্ত যখন বুঝে গেল ও সরাসরি প্রত্যক্ষ করল, তখন সে ক্রমশই হিংসুক থেকে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠল। এই হিংসা আর কিছুই নয়, এটি অভাগা, অবহেলিত, অধিকারবঞ্চিত বালকের অন্ধঅভিমান মাত্র—একে দোষের ভাগী না করে, দোষের মূলীভূত কারণটি উন্মোচনে তৎপর হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একই সঙ্গে সন্তান ও দেবরের প্রতি সমান কর্তব্য করতে প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু কিরণময়ীর মাতৃত্ব সতীশের আগমনের পর নীলকান্তের ক্ষেত্রে খাটো হয়ে গেল—যার ফলে সতীশের দোয়াতদানটি চুরি গেল। দোয়াতদানটি সতীশের খুব বেশি প্রিয় ছিল। তদ্রূপ কিরণময়ীও নীলকান্তের খুব প্রিয় ও নির্ভরতার আশ্রয় ছিল, কিন্তু সতীশ আসাতেই নীলকান্ত কিরণের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারই প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় নীলকান্ত সতীশের শখের দোয়াতদানটি চুরি করে বসল।

গল্পের চূড়ান্ত পরিণতিতে দেখা গেল, নীলকান্ত সতীশের অতিপ্রিয় দোয়াতদানটি চুরি করে, সকলের কাছ থেকে তিরস্কৃত ও প্রহৃত হয়েও চৌর্যকার্যকে স্বীকার করে নিল না। কিরণের সম্মুখে যখন তার নামে চুরির অপবাদ এল, তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, "তাহার বুকের কাছটা কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল।" (পৃ. ২৩৭) বুকভরা অভিমান নিয়ে সেখান থেকে সে চলে এল, কিরণ তাকে মৃদু স্বরে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছুই বলল না। আজ যে তার কাছ থেকে পরম নির্ভরতা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রটিও সরে গেল। সেই ভাবনার বশবর্তী হয়ে, "নীলকান্তের চোখ ফাটিয়া টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।" (পৃ. ২৩৭) সত্যি যদি সে দাগি চোর হত, তবে চুরির আনন্দে মেতে থাকত সে, যে প্রতিশোধের আগুন তার মধ্যে জ্বলে উঠেছিল—দোয়াতদান চুরির মাধ্যমে সে স্পৃহা খানিক চরিতার্থ হল ঠিকই, কিন্তু বঞ্চিত অধিকারের বেদনাবোধ নিবৃত্ত হল না। যেভাবে সে সবদিক থেকে বঞ্চিত হয়েছে তার বিনিময়ে সতীশের প্রতি ঘটানো সমস্ত ক্ষতিই অত্যন্ত সামান্য ও তুচ্ছ ব্যাপার। সাবান ফেলে দেওয়া কিংবা বস্ত্র জলে ভাসিয়ে দেওয়ার মতো সাধারণ ক্ষতি ধনী পরিবারের সতীশের কাছে প্রকৃত অর্থে কোনো ক্ষতিই না, তাই এমন একটি বস্তুর দ্বারা আহত করে তাকে আক্রান্ত করতে চাইল যাতে সেই ক্ষতির মর্ম বুঝতে পারে—যে ক্ষতি জন্মাবধি হয়ে এসেছে নীলকান্তের জীবনে। কিরণময়ী কিন্তু নীলকান্তকে চোর বলে বিশ্বাস করতে চাননি। বরং শরৎবাবু ও সতীশের দৃঢ়